বাংলার কান্তকবি রজনীকান্ত সেন
(১৮৬৫-১৯১০)

আশিস গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালির কাছে রজনীকান্ত সেন কান্তকবি নামেই সমধিক পরিচিত। এবছর অর্থাৎ ২০১৬ সালের ২৬ জুলাই তাঁর জন্মের সার্ধশত বছর পূর্ণ হয়েছে। অথচ প্রায় সারা বছর ধরেই তাঁর রচিত অসাধারণ সব সংগীত এবং জীবন চর্চা নিয়ে বাঙালি মহলে তেমন স্মরণ বা আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ল না।

রজনীকান্ত ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সুস্বাস্থের অধিকারী। ব্যায়াম ও শরীর চর্চায় তাঁর ছিল নিয়মিত অভ্যাস। মেধাবী ও প্রবল স্মৃতি শক্তির অধিকারীও ছিলেন। কিন্তু ছিলেন না একেবারেই 'গ্রন্থকীট'। অল্প পড়াশুনা করেও তিনি পরীক্ষায় বেশ ভাল ফলই করতেন। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষায় একটি কালী স্তোত্র রচনা করে শিক্ষক ও অনুরাগী মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন।

কাব্য প্রতিভা এবং সংগীতের বীজ অন্তরে নিয়েই যেন জন্ম হয়েছিল বাংলার এই কান্তকবির। তাছাড়া তাঁর বাবা গুরুপ্রসাদ সেনও ছিলেন সুগায়ক। তাঁর কাছেই রজনী কান্তের শৈশবে সংগীত শিক্ষার হাতে খড়ি। মাত্র চার বছর বয়সেই তিনি অনেক রামপ্রসাদী গান গাইতে পারতেন।

তাঁর বড়ো জ্যাঠামশাই গোবিন্দ প্রসাদ সেন ছিলেন রাজশাহি শহরের নামকরা উকিল। তাঁর কাছে থেকেই রজনীকান্ত রাজশাহির বোয়ালিয়া জেলা স্থলে ভর্তি হয়েছিলেন। অগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রজনীকান্ত মেধাবী হলেও গ্রন্থকীট ছিলেন না। তাঁর ভাষায় **'I was never a book worm, for I was blessed with my brilliant parts'.** সে সময়ের প্রথা অনুযায়ী মাত্র ১৮ বছর বয়সে হয়েও মেধাবী রজনীকান্তের পড়াশুনায় কোনো ব্যাঘাত বা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে নি। তিনি যথারীতি ১৮৮৩ সালে এনট্রান্স, ১৮৮৫ সালে এফ.এ, ১৮৮৯ সালে বি.এ এবং ১৮৯১ সালে বি.এল. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এরই মধ্যে তাঁদের পরিবারে ঘটেছিল শোকাবহ দুর্ঘটনা। তিনি যখন বি.এ ক্লাসের ছাত্র সে সময়েই অকস্মাৎ তাঁর বাবা এবং বড় জ্যাঠা মশাই ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে তাঁর উপর কিছুটা পরিবারের আর্থিক দায়-দায়িত্বও এসে পড়ে। আর সেটা পালন করতে গিয়ে তাঁর পড়াশুনায় সে সময় কিছুটা বিঘ্নও ঘটে। সব কিছু সামলে নিতে তাঁকে কিছু দিন নাটোর এবং নওগাঁয় অস্থায়ী ভাবে মুন্সেফের দায়িত্বও পালন করতে

হয়েছিল। তারপর স্বাধীন ভাবে তিনি কিছুদিন রাজশাহি শহরে এসে ওকালতি পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেন। কিন্তু ওকালতিতে তাঁর পসার যেমন জমেনি, তেমনি পেশাটা তাঁর ভালও লাগেনি। আসলে যাঁর অন্তর কাব্য প্রতিভায় পূর্ণ এবং সংগীতের অনুরণনে আচ্ছন্ন, তাঁর গড়পড়তা সাধারণ মানুষের মত পেশা মনের মত হবার কথাও নয়।

তাই একদিন তিনি তাঁর একান্ত সুহৃদ দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শরৎ কুমার রায়কে লিখেছিলেন, কুমার, আমি আইন ব্যবসায়ী কিন্তু ব্যবসা করিতে পারি নাই। আমি শিশুকাল হইতেই সাহিত্য ভাল বাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল। অত্যন্ত সঠিক কথা। কবিতা আর সঙ্গীতের রজনীকান্তই তো বাঙালির চেনা, তাঁদের প্রিয় কান্তকবি।

তিনি রাজশাহি শহরে একটি গৃহ নির্মাণ করে সেখানেই সপরিবারে বসবাস শুরু করলেন। শৈশব থেকেই কবিতা ও সংগীতের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত পক্ষে রাজশাহি শহরেই তা বিকাশ লাভ করেছিল। ঐতিহাসিক এবং লেখক অক্ষয় কুমার মৈত্রের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ওখানেই।

কান্তকবির গানের বিশিষ্ট শিল্পী নিশীথ সাধুর লেখায় দেখেছি যে রজনীকান্তর কন্যা শ্রীমতী শান্তিলতা রায়ের সান্নিধ্যে আসার সুযোগে তিনি কান্তকবির অনেক ব্যক্তিগত স্বভাবের কথাও জানতে পেরেছিলেন, যেমন রজনীকান্ত সঙ্গীত রচনা করে তা গুছিয়ে রাখতে পারতেন না। স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী চেষ্টা করতেন সে সব গুছিয়ে রাখার। কিন্তু সব হয়ত ঠিকঠাক হতোনা। ফলে গাইবার সময় অনেক গানই রজনীকান্ত খুঁজে পেতেন না। তবে তাৎক্ষণিক সঙ্গীত রচনায় কান্তকবি ছিলেন খুবই পারদর্শী। আর তাতেই বাংলার সংগীত জগৎ সমৃদ্ধ লাভ করেছিল।

ক্রমে রাজশাহি শহরের এবং সন্নিহিত অঞ্চলের নানা সাহিত্য ও সংগীত সভায় রজনীকান্ত প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়লেন। একদিন মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে তিনি একটি অসাধারণ সংগীতের পদ রচনা করে, তাতে সুর দিয়ে এবং স্বকণ্ঠে পরিবেশন করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন সে গানটি এখন বহু পরিচিত এবং বহু কণ্ঠে গীত, যার প্রথম স্তবকটি হল-

'তব চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা;
উর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভনীলা চঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর দিব্যাঙ্গনা, শান্ত কুশল দরশা।'

রজনীকান্ত সেনের প্রথম কাব্য গ্রন্থের নাম 'বাণী'। তার তিন বছর পর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত হয়ে ছিল তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কল্যাণী'। সেই কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত রজনীকান্তের একটি বিখ্যাত সংগীত সম্পর্কে বলতে হয়, প্রেক্ষাপটটি ছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়। চারিদিকে তখন দেশি জিনিস

গ্রহণ ও বিদেশি জিনিস বর্জনের স্বপক্ষে তীব্র আন্দোলন ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। সে সময়েও দেখা গিয়েছিল কেউ কেউ বিদেশি বস্ত্র পরিধানের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। সে সময়েই কান্ত কবির কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিল তাঁর সেই অবিস্মরণীয় সংগীত,

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।'

সমস্ত বাংলা যেন আলোড়িত হয়েছিল এই সংগীতের প্রভাবে। ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল কান্ত কবির নাম।

রজনীকান্ত প্রধানত একজন ভক্তিমার্গে বিচরণকারী সংগীতকার হলেও তাঁর হৃদয়ে ছিল এক অসাধারণ রসবোধের ফল্গুধারা। যাঁর প্রবাবে কান্ত কবির হৃদয়ে এই রসের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছিল তিনি ছিলেন বাংলার আর এক মহান সংগীতকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সরকারি কর্মসূত্রে এক সময় দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন রাজশাহি শহরে। সেখানেই উভয়ের সাক্ষাৎ এবং সখ্যাতা। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অন্যান্য সংগীতের সঙ্গে হাসির গান সৃষ্টিরও রাজা। তাঁর সঙ্গে সে সময়ে রজনীকান্তর প্রায়শই সাক্ষাৎ হতো। মাঝে মাঝেই বসতো সংগীতের আসর। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবেই সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতি ব্যাঙ্গ করে রজনীকান্ত রচনা করেছিলেন অসাধারণ সব হাসির গান যেমন, 'আমরা ব্রাওণ বলে নোয়াবনা মাথা/ কে আছে এমন হিন্দু....., / সে কি তোমার মত, আমার মত, রামার মত, শ্যামার মত,/ ডালা কুলো ধামার মত- যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে?..... তোরা ঘরের পানে তাকা/ এটা কফ ভরা রুমালের মত,/ বাইরে একটু আতর মাখা/' ইত্যাদি। রজনীকান্ত তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে আরও ছটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যেমন 'অমৃত'(গীতি কবিতা), 'আনন্দময়ী'(আগমনি ও বিজয়া সংগীত), 'বিশ্রাম' (কাব্য), ।

যে সময়ে ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ বাংলার এই অসাধারণ সংগীত স্রষ্টা কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের হৃদয় মথিত করা অসাধারণ সব সংগীত তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে যেমন, 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর....', ওরা চাহিতে জানেনা দয়া ময়....., আমি অকৃতি অধম.....এবং তোমার দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়া দুখ..... প্রভৃতি অসাধারণ সব সংগীত এবং তার ফলে তিনি যখন যশ ও খ্যাতির মধ্যগগনে তখনি তিনি আক্রান্ত হলেন সে সময়ের দুরারোগ্য কর্কট রোগে। তাঁকে সুচিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। সংগীত রচনার সঙ্গে গাইতেও যিনি অত ভাল বাসতেন, বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সে গানও তিনি আর গাইতে পারছিলেন না। কী এক অসহনীয় পরিস্থিতি। এই সময়ে তিনি যেন নিজেকে আরো বেশি ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করলেন। লিখে চললেন একের পর এক নিবেদনের গান। নিজে গাইতে না পারার জন্য সুর নির্দেশ করে শুনতে চাইতেন অপরের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অত্যন্ত স্নেহধন্য বাংলার কান্তকবি

রজনীকান্ত সেনের মৃত্যু শয্যার পাশে ছুটে এসেছেন বার বার। এসেছেন দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমুখ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনিষীরা।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অনন্ত পথের যাত্রী বাংলার কান্ত কবিকে শেষ বারের মত দেখতে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁকে দেখে রোগ-যন্ত্রণা ক্লিষ্ট রজনীকান্তর মুখ আনন্দে ভরে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে দেখে হাসপাতাল থেকে ফিরে গিয়ে রজনীকান্তর উদ্দেশ্যে যে পত্রটি লিখেছিলেন, প্রাসঙ্গিক মনে করে তার থেকে দু-একটি বাক্য এ নিবন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'প্রীতি পূর্ণ নমস্কার পূর্বক নিবেদন-

সেদিন আপনার রোগ শয্যার পাশে বসিয়া মানবত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি..... ঈশ্বর যাহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন করিয়া গম্ভীর ভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবন সংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা সংগীত তাহারই প্রতিধ্বণি বহন করিতেছে।

ইতি আপনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

ভক্তিমার্গে নিমজ্জিত এই গীতিকার তাঁর রচিত বহু সংগীতে নিজেকে 'অকৃতি অধম', 'পাতকী' এবং 'কাঙাল' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে বারংবার অপরাধী হিসেবে সমর্পণ করলেন কেন? কি তাঁর অপরাধ? এ প্রশ্ন মনে জাগরিত হওয়া হয়ত অস্বাভাবিক নয়। তবে হতে পারে, সম্পূর্ণ অন্য জগতের এক অনুভূতি থেকেই উদ্ভুত কবির এই মানসিক অবস্থান, যা হয়ত অনেকেরই কল্পনার বাইরে।

তাঁর সার্ধশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলার কান্তকবি রজনীকান্ত সেনকে স্মরণ করে, তাঁরই আত্মনিবেদিত সংগীত সত্তার একটি অবিস্মরণীয় সংগীতের উল্লেখ করে এবং তাঁর প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিবন্ধটি শেষ করি....

'কবি ভূষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে,
কবে তাপিত এ চিত্ত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা চন্দনে।
কবে তোমার হয়ে যাব আমার আমি হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে রবে ধারা,
এদেহ শিহরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ বিপুল পুলক নন্দনে।
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবেনা, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।'